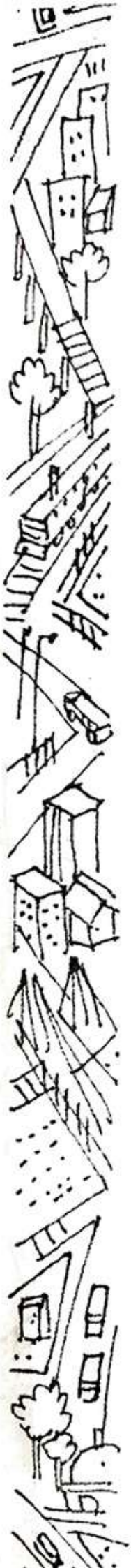

জলছবি

বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ,নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

সী মা ন্ত গ ন্ জ

'জলছবি' উপন্যাসটির চারটি পর্যায়। যার একটার সঙ্গে আরেকটার 'ইনার কানেকশন' থাকলেও প্রতিটিই এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। 'সীমান্তগন্জ' জলছবি উপন্যাসটির প্রথম পর্যায়। এই অংশে রয়েছে উপন্যাসের নায়ক সঞ্জুর ছোটবেলার কথা। যেখানে সীমান্তগন্জের বর্ণময় প্রকৃতিতে কামিনীর পাগল-করা মিষ্টি গন্ধ, শিউলি ফুলের বোঁটার মধ্যে ফুঁ-দিয়ে বাঁশি, তারা খসার মতো টুপ্ করে ঝরে পড়া বকুল ফুলের বিষণ্ণতা, ছোট্ট সবুজ ভুঁইকুমড়োর মতো নলফল, শরশয্যার কাঁটায় বিক্ষত বুক-চেতানো ফণি-মনসা, রাম-সীতা ফল, রাঙচিতার পাতলা আঠায় বানানো নৌকো, ঝাঁকড়া বাব্লার মগডালে ঘুট্ঘুটে অন্ধকারে জোনাকীর জ্বলা-নেভা, ঝিঁঝিঁ পোকার ল্যাজে সুতো বেঁধে ওড়ানো; গ্রীষ্মকালে পাকা ধানের সঙ্গে আমের মুকুল আর সজ্নে ফুলের গন্ধ মিলেমিশে আকাশ-বাতাসে ভেসে বেড়ানো আকুল করা পাগল-পাগল গন্ধ; বর্ষাকালে ঝম্ঝমে বৃষ্টিতে কচু পাতা মাথায় দিয়ে পাঠশালায় ছুটে আসা, বৃষ্টি শেষে হাত্নেতে নেমে সেলেট-শুকোনোর ছড়া বলা ঃ

জলের পোকা জলে যা।
আমার সেলেট শুকিয়ে যা।।

পাঠশালার পাঠ চুকিয়ে সীমান্তগন্জের প্রকৃতি-পুত্র সঞ্জু, মেলার অস্থায়ী ঘরের সামনে আবিষ্কার করে তার রূপকথার রাজকন্যে-কে।।

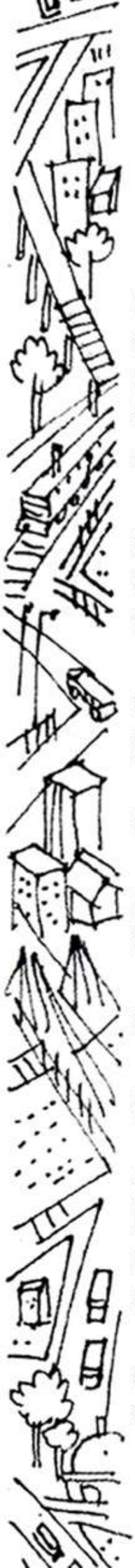

সীমান্তগন্জ একটা গ্রামের নাম। সেইখানে ছিল আমাদের আদি বাড়ি। নেকগুলো মাটির ঘর। খুব উঁচু হাত্নে। বাড়িটার চারদিকে কঞ্চি আর চটার ড়া। বেড়ার মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো বাঁশ-খুঁটি পোঁতা। কোথাও বাঁশের াজ করেছে সজনে গাছ। কোথাও মাদার গাছ। কঞ্চি-চটার বেড়ার ফাঁকে-াকে রাঙচিতার ঘন-সবুজ পুরু পাতারা ঢুকে পড়েছে। এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় লাইয়ের মতো।

রাঙচিতার কালচে-সবুজ পাতার মাঝখানে দারুণ মজা। পাতাটার দু-কোণ রে একটু চাপ দিলেই তা ফেটে ফাঁক হয়ে যেত। সেটা তখন নৌকা। সেই ৌকার ভেতরটা ভরাট হয়ে থাকত পাতলা আঠায়। হালকা সাদা মসলিনের াড়ির মতো।

সকলে যে এমন করতে পারত, তা কিন্তু নয়। তখন না-পারা হিংসুটে পাশ থকে অন্যেরটায় ফুঁ দিত। রেশমের মতো সাদা পর্দাটা যেত ছিঁড়ে। অমনি শুরু য়ে যেত নিজেদের মধ্যে অল্প অল্প মারামারি। বেশি বেশি মুখ ভার।

এই খেলা খেলতে গিয়ে রাঙচিতার আঠায় তপনের একটা চোখ চিরকালের ন্য কানা হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের বাড়িটা ছবির মতো। বাড়িতে ঢুকতে হত একটা চটার গেট ঠেলে। ামরা তাকে 'টাটি' বলতাম। হাত দিয়ে টাটিটাকে উঁচু করে তুলে ধরলে তবেই ঠলে পাশে সরানো যেত। তারপর বাড়ির মধ্যে ঢোকা।

বাড়িতে ঢুকেই বাঁদিকে পুকুর। পুকুরের গায়ে একটা বাঁকা কুলগাছ। সেটা লের দিকে হেলে পড়েছিল। দু' একটা ডাল ঝুঁকে জল ছুঁয়ে থাকত।

গাছটার স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। কিন্তু কুল হত প্রচুর। আমরা বলতাম, 'নারকেল ল'। ঝড়-বাদলের পর কত কুল ভেসে থাকত সেই পুকুরের জলে!

আমাদের হাত্নের বাঁদিকে ছিল একটা আমগাছ। কাঁচামিঠে। এক গ্রীষ্মের পুরে সেই হাত্নেতে বসে আমি পড়ছিলাম। হঠাৎ আমার চোখ চলে যায় াছতলায়। সেখানে একটা আম পড়ে থাকতে দেখি। দৌড়ে যাই। একটা আমের চাকলা। কেউ খেয়ে ফেলেছে। খোসাটা উপুড় হয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল একটা াস্ত আম।

ফালুক-ফুলুক করে এদিক-ওদিক তাকাই। কেউ দেখতে পায়নি আমাকে। াড়াতাড়ি ফিরে এসে দেখি সেজদি। আমি বলতাম মণিদি। ও আমার দিকে াকিয়ে ফিক ফিক করে হাসছিল। তখন ওকে খুব কিল-চড়-ঘুসি মারি।

বাড়ির ভেতরে আমাদের জমি ছিল কয়েক বিঘে। সেখানে কতরকমের গাছ-গাছালি যে লাগিয়েছিলেন আমার বাবা। সেই বিশাল বাগান বাড়িটা দেখার মতো।

একটা ধিঙ্গি-লম্বা ডেঁয়ো গাছ ছিল। কেউ কেউ ড্যাবলাও বলে। এবড়ো খেবড়ো দেখতে। একটু কমলা রঙের। ফলটার স্বাদ দারুণ। মিষ্টি-মিষ্টি টক-টক। তার বিচিগুলো পাতিলেবুর বিচির থেকে সামান্য বড়ো হবে। ধবধবে সাদা। ইঁদুরের দাঁত যেন। ছোটোবেলায় দাঁত পড়ে গেলে সেটা আমি রেখে এসেছিলাম ইঁদুরের গর্তে।

আমাদের বাড়ির পশ্চিমে ছিল খাটা পায়খানা। সেখানে কত ইঁদুরের গর্ত। মণিদি বলে, আমি নাকি আমার দাঁতগুলো ভুল করে ছুঁচোর গর্তে রেখে এসেছিলাম। হয়তো সেজন্যই এত বড়ো বড়ো—।

ডেঁয়োর ডানদিকের বেঁটে নারকোল গাছটাতে ডাব হত অসংখ্য। তার পাশে ছিল একটা কুয়ো। তার মধ্যে আমি একবার পড়ে গিয়েছিলাম। তখন গাছ থেকে ডাব পাড়া হচ্ছিল। আমার হাতে ছিল একটা ডাব। গাছের দিকে তাকাতে তাকাতে পিছোচ্ছিলাম আমি। তারপর ধপাস্।

জয়দা তখনই কুয়োয় ঝাঁপ দেয়। আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে আনে। রাঙাদা ভয়ে কাঠ। জল গিলে খুব নাকানি-চোবানি খেয়েছিলাম আমি। তবু, আমার হাতে তখনও শক্ত করে ধরা ছিল ডাবটা। আমার বড়দার নাম জয় রেখেছিল বড়ো মা। মেজদাকে আমরা রাঙাদা বলতাম। সম্ভবত তাঁর রঙ-মাহাত্ম্যে।

হাজারি-নারকোল গাছটার ডানদিকে ছিল সরু লম্বা একটা ফলসা গাছ। ফলসা ফলের রঙ যে কী সুন্দর। সবুজের সঙ্গে হালকা জাম মেশালে যেমন হয়। আবার ঠিক জামের মতো মসৃণ নয়। বরং একটু ঘষা-ঘষা। ছোটো ছোটো ফল। অম্লমধুর। খুব ভালো লাগত খেতে।

নল গাছও ছিল আমাদের। ছোট্ট সবুজ ভুঁইকুমড়োর মতো দেখতে। খুব টক। নুন দিয়ে খেতাম আমরা। আমাদের আঁশফল গাছটা ছিল বেশ লম্বা। ফলটার রঙ সবেদার মতো। খোসাটা তেমন নরম নয়। শক্ত। পুরু। নল ফলের মতো ছোট্ট ছোট্ট সাইজ। তবে সুগোল। খোসা ছাড়ালেই একটা ছোট্ট লিচু।

কলা বাগান রেখে আরো কিছুটা পশ্চিমে ছিল খাটা পায়খানা। তার সামনে থাকত একটা বদনা। বকের মতো লম্বা গলা। আমরা বলতাম গাড়ু। গাড়ুর কাণা ধরে কেতলির মতো নলটা দিয়ে আমরা জল ঢালতাম।

বদনার কোনো হ্যান্ডেল ছিল না। ছাতা পড়া পিচ্ছিল কাণাটা খুব সাবধানে

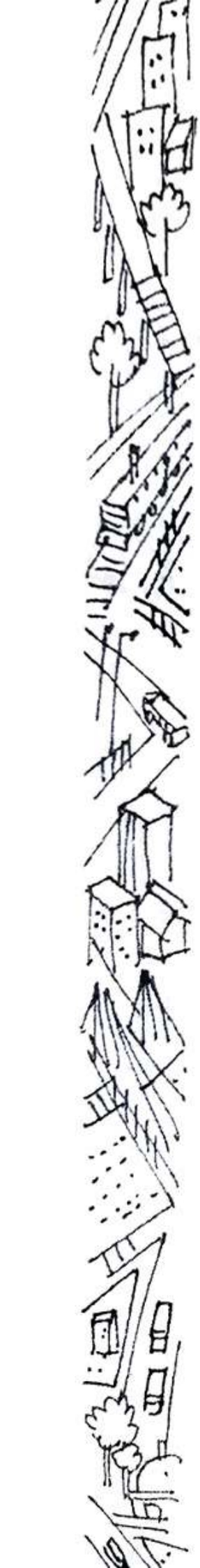

ধরতে হত। হাত পিছলে গেলে সোজা গিয়ে পড়বে থপ করে। অনেক নীচে।

কাঠের পাটাতনের ওপর দু'দিকে দু'পা দিয়ে বসতাম আমরা। সামনের দিকে টাঙানো থাকত শুধু একটা চট। তাও শতচ্ছিন্ন। আর তিনদিক পুরো ফাঁকা।

রাত্তিরে টেমি নিয়ে পায়খানায় যেতাম। একদিন মাঝরাতে আমার সে কী পেটব্যথা! মা এসে বসেছিল কিছুটা দূরে। সেখানেই ঝিমুচ্ছিল মা। আমার ফেরার অপেক্ষায়।

কিন্তু ফিরব কী করে? আমি তখন ভয়ে পাথর। পায়খানা থেকে উঠে আসার ক্ষমতাই নেই।

সেখানে বসে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, কলা বাগানের মধ্যে একটা সাদা ভূত। শাঁকচুন্নিই হবে। সাদা কাপড়ে অনেকটা ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে। মনের আনন্দে এদিক ওদিক দুলছেও।

'মা-মা' বলে চিৎকার করি আমি। কিন্তু মা আর আসে না। আমার গলা দিয়ে তখন হয়তো স্বর বেরুচ্ছিল না। নাকি মা ঘুমিয়ে পড়েছিল? শেষ পর্যন্ত মা আসায় ধড়ে প্রাণ ফিরে পাই।

ব্যাপারটা কিছুই নয়। কিন্তু সেদিন সেই গভীর রাতে কলাবাগানে আমার যা অবস্থা হয়েছিল, তা আজ আর লিখে বোঝানো যাবে না। একটা নুয়ে পড়া শুকনো কলাপাতার ওপর চাঁদের আলো পড়েছিল। হাওয়ায় তা দুলছিল। সেটাকেই আমি ভূত ভেবে ভয়ঙ্কর ভয় পেয়েছিলাম। তা নিয়ে পরে আমি লিখেছিলাম ঃ

ঘুমের ঘোরে জোছ্না রাতে বাইরে এসে দেখি
ঘোমটা দেওয়া, সাদা কাপড়, ভূত একটা; একী!
কাঁপছে আমার বুক
চারদিকে নিশ্চুপ
কাছে যেতেই নুইয়ে আছে, কলার পাতা দেখি।

আমাদের বাইরের হাত্নেতে ওঠার সিঁড়ির দু'ধারে দুটো রঙ্গন ফুলের গাছ ছিল। বেঁটে। ঝাঁকড়া। গোছা-গোছা, থোক থোক ফুল হত তাতে। সিঁদুর রঙের। তিরের মতো লম্বা লম্বা সরু সরু দেখতে। প্রতিটা তিরের মাথায় একটা ছোট্ট লাল গোল টিপ। তাতে গন্ধ ছিল না একটুও। দেখতে অপূর্ব। অধিকাংশ রঙিন ফুলে গন্ধ থাকে না। বর্ণহীন ফুলে গন্ধ বেশি। স্রষ্টা বোধহয় সবকিছুতেই ভারসাম্য রক্ষা করেন।

পুজোর সময় ভোরবেলায় আমাদের সারা বাড়ি ম-ম করতে শিউলি ফুলের

হালকা মিষ্টি গন্ধে। কমলা রঙের ছোট্ট সরু বোঁটার মাথায় ফরসা ফুলগুলো শুয়ে থাকত শিউলিতলায়। তা দেখে আমার কেমন মায়া হত।

শিউলি ফুলের বৃন্তের মধ্যে ঝাঁটার কাঠির সরু ডগা ঢুকিয়ে দিতাম আমরা। তার ভেতর থেকে মাজ বেরিয়ে আসত। তখন সেই বোঁটায় ফুঁ দিলেই বাঁশি।

আমাদের বাড়ির সামনে লম্বা একটা কামিনী গাছ ছিল। কামিনী খুব সুখী গাছ। তার ফুল আরো সুখী। ছুঁলেই ঝরে পড়ত পাপড়ি। গাছের তলায় তখন একটুও মাটি দেখা যেত না। কামিনীর ছিন্ন পাপড়িতে সাদা হয়ে থাকত।

রাতে শোওয়ার পরও কামিনীর মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসত। ফুলের বোঁটা থেকে ঠিক তখনই কি পাপড়িগুলি ঝড়ে পড়ত? আঁধার রাতের নিরিবিলিতে বাতাস কি তার গতি বাড়ায়? কামিনীর মধুর গন্ধে বিভোর হয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়তাম আমি।

বকুল ফুলও গাছতলায় পড়ে থাকত রাশি রাশি। হালকা চন্দন রঙের ছোট্ট ছোট্ট ফুলগুলো কুড়িয়ে এনে ঘরে রাখতাম আমি। যত শুকিয়ে আসত ততই গন্ধ ছড়াত ফুলগুলো। বকুলতলায় দাঁড়িয়ে তারাখসার মতো টুপ-টুপ-টুপ করে বকুল ফুল ঝরে পড়তে দেখেছি। তখন অদ্ভুত ধরনের মন কেমন করত আমার।

আমাদের ভেতর বাড়ির পুকুরটায় ছিল কচুরিপানা। সেই অচ্ছুৎ পানা ফুলের হালকা বেগুনি রঙটা যে কী মিষ্টি দেখতে! বড্ড আদুরে ফুল। আতুসী। জল থেকে ছিঁড়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে হাতের মধ্যে নেতিয়ে পড়ত।

ভোরবেলা আমার ঘুম ভেঙে যেত। পোষা মুরগির ডাক শুনে। আশ্চর্য এক পাখি! কী নিখুঁত সময়জ্ঞান! মুরগির প্রথম ডাক শুনে ঘড়ির দিকে তাকাও। ঠিক পাঁচটা।

ভোরবেলা 'কোঁকর-কোঁও-ও-ও' বলে গলা ছেড়ে গান ধরত ঝুঁটিওলা মোরগটা। সে এক লম্বা সুরেলা ডাক। পর পর তিনবার। কুম্ভকর্ণ না হলে ঘুম তোমার ভাঙবেই।

ডিম পাড়ার পর গৃহস্থকে জানান দেবার জন্য মুরগি ডাকবেই। তবে সে ডাক ভোরের মতো রেওয়াজি নয়। কক্-কক্ করে অল্প দু-চারবার।

ডিমে তা দেওয়া মুরগি যদি কোন কারণে একবার উঠে পড়ে তবে একটানা কক্-কক্-কক্ করে সে ডেকেই যাবে। সে ঘ্যানর ঘ্যানর বিরক্তিকর। যতক্ষণ না আবার তায়ে বসতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে সেই কর্কশ একঘেয়ে ডাক। তা দেওয়া মুরগি খুব রাগী হত। তার কাছে গেলেই ঠোকরাতে আসত। বোধহয় তখন থেকেই সন্তান রক্ষার মাতৃদায় এসে যেত তার মধ্যে।

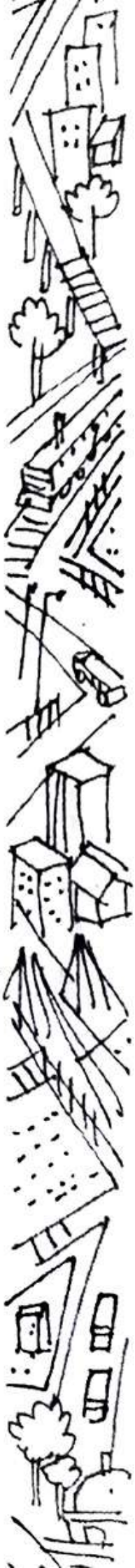

একটা বড়ো লোহার কড়াইয়ের ওপর অনেকটা ধানের খোসার গুঁড়ো ছড়িয়ে রাখত মা। সেই তুষ-কুঁড়োর উপর বসানো হত গোটা দশ বারো ডিম। সেখানে গিয়ে তা দিত ভাবী মা মুরগি। দিনের পর দিন। অবিচল নিষ্ঠায়। খাওয়া-দাওয়াও সেখানেই। অনাগত সন্তানদের ছেড়ে সে সহজে উঠত না।

যথা সময়ে মা-মুরগি তোর পেটের তলায় ডিমগুলো ফুটো করে দিত। সেখান থেকে বেরিয়ে আসত মুরগি ছানা। তারপর কিছুদিন ধরে এক দঙ্গল বাচ্চা নিয়ে মা-মুরগি খালি টৈ টৈ করে ঘুরে বেড়াত।

আমি মুরগির ডিম পাড়া দেখেছি। ডিমটা পিছন থেকে বেরিয়ে এলে হুস্ হুস্ করে মুরগিটাকে তাড়িয়ে দিতাম। তখনি সেটা হাতে নিয়ে দেখতাম তুলতুলে নরম। তালুর ওপর ডিমটা টল-টল করত। অল্প সময়ের মধ্যে চামড়ার মতো ডিমের নরম আবরণটা শক্ত খোলা হয়ে যেত হাতের ভিতরে। মুরগিটাকে না তাড়ালে আরও কিছু সময় সে বসে থাকত তার ডিমের উপরে। তখন সেই ওমে শক্ত হয়ে যেত ডিমটা।

সূর্য ওঠারও আগে উঠে পড়ত আমার মা। মুরগির প্রথম ডাকের আগেও। সূর্য ডুবে গেলেও মায়ের কাজ শেষ হত না। এখন উদয়াস্ত পরিশ্রমের কথা শুনলে, আমার মায়ের মুখটা মনে পড়ে।

ভোরে উঠে আমার মা লোহার বালতিতে তাল তাল গোবর গুলত। সেই গোবর জলে লেপা হত উঠোন-হাত্নে-ঘর-বার সর্বত্র। সব শেষে তুলসীতলায়।

বালতি নিয়ে পুকুরে নামার সময় মানুষটা হাঁপাত। শীতকালেও ঘেমে যেত মা। আমি মায়ের আঁচল দিয়ে মুছে দিতাম তার কপালের ঘাম। 'তুই আমার সঙ্গে সর্বক্ষণ ঘুরঘুর করিস কেন বলত সঞ্জু। সকালে তো একটু বই-টই নিয়ে বসতে পারিস।'

চান করে পুকুর ঘাটে কাপড় ছেড়ে উঠে আসত মা। নিকোনো উঠোন দিয়ে। সোজা ঠাকুর ঘরে। তখন মায়ের পায়ের জলছবি দেখে আমার লক্ষ্মীর পাঁচালির কথা মনে পড়ত।

পুজো করে ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলে মাকে তখন ক্যালেন্ডারের সারদা মায়ের মতো দেখতে লাগত। কী শান্ত-সুন্দর মূর্তি! আলগা গা। খালি পা। পরনে গরদের শাড়ি। টুকটুকে লাল পাড়। কপালে ভেজা সিঁদুরের টিপও টকটকে লাল।

মায়ের এক ঢাল লম্বা চুলের গোড়া থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ত তখনও। তার হাতে থাকত ছোট্ট একটা রেকাবি। তাতে সামান্য ফলমূল। সকালে মায়ের বাড়ানো হাতের প্রথম প্রসাদ পেতাম আমি।

আমাদের দুটো গোরু ছিল। তার মধ্যে একটা বাচ্চা। সেই বাছুরটাকে হতে